বাংলাদেশে প্রচলিত শির্ক বিদ‘আত ও কুসংস্কার পর্যালোচনা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মো: আব্দুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

بعض أنواع الشرك والبدع المنتشرة في بنغلادش

« باللغة البنغالية »

محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

১.ভূমিকা

ঈমান হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাওহীদ ও একত্ববাদ হচ্ছে এই ঈমানের মূল ভিত্তি। আর শির্ক ও বিদ‘আত হচ্ছে এই মূল ভিত্তি বিধ্বংসী। আমাদের দেশে এই ভয়াবহ শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার বড় অভাব। সেজন্য সমগ্র সমাজে রয়েছে শির্কের ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রে বিদ‘আত বলে শির্ককে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। এর কারণ হলো শির্ক ও বিদ‘আত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা। মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটিকে শির্ক ও বিদ‘আত মুক্ত করার গুরু দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। আর এ জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শির্ক ও বিদ‘আত সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা। সেই প্রেক্ষাপটে এখানে বাংলাদেশে প্রচলিত শির্ক ও বিদ‘আত সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২.শির্কের পরিণতি

শির্ক তাওহীদের বিপরীত। ইসলাম যে সব মূলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তাওহীদ বা একত্ববাদই হচ্ছে তার মূলসার। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা‘আলাকে ইবাদাতের (উলুহিয়াত)[1] ক্ষেত্রে,

[1] . যেমন কুরবানী, মানত, দো‘আ, ভরসা (তাওয়াক্কুল), ভয়, আশা, বিনয় অবনত হওয়া, আশ্রয়

সৃষ্ট বিষয়ক ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণের (রবুবিয়াত)[2] ক্ষেত্রে, নাম ও বিশেষণের (আসমা ওয়াসসিফাত)[3] ক্ষেত্রে কোনও অংশীদার ছাড়াই এক ও একক বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলে।[4] প্রতিপালন, আইন, বিধান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র অধিকারে কাউকে শরীক করা বা অংশীদার বানানোই হচ্ছে শির্ক।[5] ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি অনু-পরমাণু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামে এমন কোনো নিয়মনীতি নেই, যেখানে এই শির্কের

প্রার্থনা করা প্রভৃতি। আল-বালিহী, ছালিহ ইবন ইব্রাহীম, আকীদাতুল মুসলিমীন অর-রুদ্দু আলাল মুলহিদীন অল- মুবতাদি‘ঈন, আল- মাতাবিঈ আল- আহালিয়াহ, রিয়াদ ১৮০৯ হিজরী, ৩য় মুদ্রণ, ১ম খ. পৃ. ৩২৯-৩৩০।

2 . যেমন সৃষ্টি, জীবিকা, দান, হায়াত ও মাউত, কল্যাণ ও অকল্যাণ, পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী ইত্যাদি। প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ৩২৭।

3 . মহান আল্লাহর নাম শুধুমাত্র নিরানব্বই তে নির্দিষ্ট নয়। প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৩৩১।

4 . তাওহীদের উপরে উল্লেখিত যথা: তাওহীদুর রাবুবীয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন- আদ-দুআইশ, আহমাদ ইবন আব্দুর রাজ্জার সংকলিত, ফাতাওআ আল-লাজনাতুদ্দায়িমাহ লিল বুহুছিল ইসলামিয়া অল-ইফতা, দারূল ইফতা, রিয়াদ, ১৪১১ হিজরী, ১ম প্রকাশ, ১ম খ, পৃ. ২০।

5 . ড. সালিহ আল-ফাওযান, আল ইরশাদ ইলা সহীহিল ই‘তিকাদ ওয়ার-রাদ্দু ‘আলা আহলিশ শির্কি ওয়াল-ইলহাদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লি ইদারাতিল বুহূসুল ইসলামিয়্যা অল ইফতা অদদা’ওয়াতি অল-ইরশাদ, রিয়াদ, ১৪১৩ হি: ১ম মুদ্রণ, পৃ. ৩১। শির্কের বিস্তারিত প্রকারভেদ দেখুন ইবন তাইমিয়াহ, শাইখুল ইসলাম আহমাদ, মাজমু’আ ফাতাওআ, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ ১৯৯১, ১ম খ, পৃ. ৯৭-৯৯।

সামান্য গন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে। ইসলামে শির্ক হচ্ছে একটি ভয়াবহ কবিরা গুনাহ।

আমাদের সমাজের অনেক আলিম ও বিদ্বানগণও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, না বুঝে, অলক্ষ্যে কিংবা আধুনিক ইসলামের প্রবক্তা সেজে মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাসের মূল সার- এই তাওহীদকে উপেক্ষা করে শির্কে নিমজ্জিত হচ্ছেন। মহান আল্লাহর ভাষায়-

﴿ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ۝١٠٦ ﴾ [يوسف: ١٠٦]

অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও তারা মুশরিক।[6]

তাওহীদ ও শির্ক পরস্পরে সাংঘর্ষিক। যে তাওহীদ লালন করবে, সে একত্ববাদী মুসলিম। আর যে শির্ক চর্চা করবে সে মুশরিক। মুসলিম বলে দাবী করার তার কোনো অধিকার নেই।

শির্কের পাপটি জঘণ্য পাপ। যারা এই পাপের ধুম্রজালে জড়িয়ে যায়, তারা মহান আল্লাহর ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

---

[6]. সূরা ইউসুফ: ১০৬।

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨ ﴾ [النساء: ٤٨]

“যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায়, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে তিনি চান ক্ষমা করবেন।”[7]

শির্ক সকল ভাল আমলকে ধ্বংস করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ ﴾ [الزمر: ٦٥]

“আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর সাথে শির্ক করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন বলে গণ্য হবেন।”[8]

শির্ক জাহান্নামকে অনিবার্য করে: আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ [المائدة: ٧٢]

---

[7]. সূরা আন নিছা: ৪৮।

[8]. সূরা আয যুমার:৬৫।

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন; তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।”[9]

যারা শির্ক চর্চা করে, তাদের রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল, হত্যাযোগ্য। আল্লাহর ভাষায়-

﴿ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ ٥ ﴾ [التوبة: ٥]

“অতঃপর শির্ককারীদের যেখানে পাবে তাদেরকে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর ও অবরুদ্ধ কর। আর তাদের ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে বসে থাকো।”[10]

শির্ক একটি বড় গুনাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عن أبي هريرة رضى الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات.... الإشراك بالله...

---

[9] . সূরা আল মায়িদাহ: ৭২।

[10] . সূরা আত তাওবাহ: ০৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ধ্বংসকারী বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাক, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শির্ক করা।...[11]

সুতরাং শির্ক অত্যন্ত জঘন্য। মুসলিম জীবনের কোনো অংশে এই শির্ক অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই। প্রতিটি মুসলিমের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমান। আর এই ঈমান বিধ্বংসী শির্ক হতে বেঁচে থাকা হচ্ছে তার ঈমানের অনিবার্য দাবী। আমরা অনেকেই এই শির্কে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে নিমজ্জিত হই। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এর প্রবল স্রোতে ভেসে যাই। ভয়াল বিভীষিকাময় এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য শির্ক সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন।

৩. বাংলাদেশে শির্ক ও বিদ‘আতের ভয়াবহতা

বাংলাদেশ ইসলামের মূল ভূখণ্ড মাক্কাহ মুকাররামাহ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ হতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই ভূখণ্ডও বহু ঈশ্বরবাদী আকীদার লালনভূমি ছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মূলত তাওহীদবাদী জীবন ব্যবস্থা। একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। এই ভূখণ্ডের যারা এই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন, মূলতঃ তারা ছিলেন অন্য ধর্মাবলম্বী।

---

[11] . বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহুল বুখারী, আলামুল কুতুব, বাইরূত, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

নিষ্কলুষ একত্ববাদ কেন্দ্রিক ইসলাম এই ভূখণ্ডের জনসাধারণ যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন তারা সরাসরি বহু ঈশ্বরবাদী দর্শনকে নিজেদের মন-মস্তিস্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেললেও তাদের সমাজ-সামাজিকতা, আচার অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-সভ্যতার সবকিছু বহু ঈশ্বরবাদী দর্শন মুক্ত হতে পারেনি।[12] তাছাড়া এ ভূখণ্ডের অনেকেই তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলিমও হয়নি। সেজন্য তাদের বহু ঈশ্বরবাদী শির্ক এ ভূখণ্ডে ছিল বেশ জোরদার। সে জন্য বলা যায়, এখানের অনেকেই মুসলিম হলেও এ ভূখণ্ড শির্ক ও বিদআতী আকীদা বিশ্বাসের অক্টোপাশ হতে কখনো পরিপূর্ণ মুক্ত হয়নি। আমাদের সমাজে যে শির্কের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার একটা বড় অংশ আমাদের আশেপাশে বিদ্যমান এই বহু ঈশ্বরবাদ ও শির্কের প্রভাবেরই ফল। পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ও হিমালয় উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত শির্কের প্রভাবও এ অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়।

এক দিকে চারিপার্শ্বে বহু ঈশ্বরবাদী শির্কে আকিদা বিশ্বাস প্রভাবিত আচার আচরণ, সমাজ সামাজিকতা, নিয়ম পদ্ধতি; অপরদিকে মুসলিম বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন যুগ থেকে বাংলাদেশের

[12]. আকরম খাঁ, মওলানা মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ এন্ড পাবলিসেন্স, ঢাকা ১৯৬৫, প্রথম মুদ্রণ, পৃ. ৯৮।

মুসলিম সমাজের একটা বড় স্থান শির্ক দখল করে নিয়েছে।[13] বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষ হিসাবে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীনতা, পূর্ব পুরুষদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্ধ অনুকরণ, ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অতিরঞ্জন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল, ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিস্তারিত এ বিষয়টির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক সংক্ষেপে আলোচিত হল:

৩.১ মানুষকে বিধান প্রণয়নের উন্মুক্ত অধিকার প্রদান:

বাংলাদেশে যে সব শির্ক লালন হচ্ছে, এটি তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শির্ক। কেননা চলার পথ পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, অন্য কথায় বিধান প্রণয়নের অধিকার ইসলামে মহান আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে অন্য কারো সামান্য নাক গলানোর অধিকার নেই। উদাত্ত কণ্ঠে এরশাদ হল:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٤]

[13]. বাংলার তদানীন্তন মুসলিম শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (মৃত. ১৫১৯ খৃ.) এবং দীনে ইলাহি নমে অনৈসলামী জীবন বিধান প্রবর্তক বাদশাহ আকরব (মৃত ১৬০৫ খৃ.) এর সরাসরি সহযোগিতায় মুসলমানদের মধ্যে মূর্তিপুজা ও অগ্নিপূজার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। বিস্তারিত দেখুন, আকরাম খাঁ, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ ও ৯৮।

সাবধান! সৃষ্টি যার, নির্দেশ দানের একমাত্র অধিকারও তার।[14] সুতরাং শরীয়াত প্রণয়নে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ অথবা অন্য কাউকে এ বিষয়ে সামান্য অধিকার দান শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সার্বিক বিধান প্রণেতা মেনে নেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١]

"তারা কি আল্লাহর এমন কিছু অংশীদার তৈরী করে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য সেই জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[15]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে বিধান প্রণয়নের এই শির্ক চর্চা আমাদের মুসলিম জনপদকেও গ্রাস করে বসেছে। সংসদকে আল্লাহর বিধান বিরোধী বিধান প্রণয়নের অধিকার দানও এই শির্ক চর্চারই শামিল। আল্লাহ'র হারামকৃত সুদ এখানে বৈধ, মদ এখানে পরিপূর্ণভাবে অবৈধ নয়, বেশ্যালয়ের লাইসেন্স পাওয়াও আইনগত

---

[14]. সূরা আল- আ'রাফ: ৫৪।

[15]. সূরা আশ-শূরা: ২১।

বাধা নেই, ইত্যাদি অসংখ্য কাজ- যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা আজ এখানে বৈধ করে রাখা হয়েছে।[16]

তবে দুনিয়ার যে সকল বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ বিধান দেন নি, সেগুলোতে যদি শরীয়ত বিরোধিতা না থাকে তবে তা প্রণয়ন করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মানুষ আল্লাহর বিধানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে শরীয়ত বিরোধী মানুষের তৈরী বিধানকে নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে, যা নিঃসন্দেহে শির্ক ও কুফরী।

৩.২ জ্যোতিষ বিদ্যা ও ভাগ্যগণনা:

আমাদের দেশে মানুষ ভবিষ্যত ভালো মন্দ জানার জন্য ভাগ্য গণনা করতে জোতিষবিদ ও গণকের কাছে গমন করে। অথচ অদৃশ্য বস্তু ও ভবিষ্যত বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলার জন্যই নির্ধারিত, আল্লাহ বলেন:

---

[16] . সূরা আত-তাওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ের হাদীসসমূহ দেখুন, আল-কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, আল-জামি' লি আহাকামিয়া কুরআন, দারুল ইহইয়া লিত-তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৮৫, ৮খ, পৃ. ১১৯-১২০; আত-তাবারী, ইবন জারীর, জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুরআন, দারুল-কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯২, ৬খ, পৃ. ৩৫৩-৩৫৬।

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ٦٥ ﴾ [النمل: ٦٥]

আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানেন না।[17]

অন্য কেউ এ বিষয়ে জানার দাবী করা, বা জানার চেষ্টা করা, মুলত: আল্লাহর সংরক্ষিত অধিকারকে খর্ব করার শামিল, যা মুলত: শির্কেরই অংশবিশেষ। আমাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা, রাশি নির্ণয়, ভাগ্য গণনা, পাখীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার নামে যে সকল কাজ কর্মের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়, তা ভবিষ্যত জানারই অপচেষ্টা মাত্র। এটি মুলত: শির্ক। বড় বড় সাইন বোর্ড টাঙিয়ে ভাগ্য গণনা ও রাশি নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। পত্রিকায় ঘটা করে রাশি নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতবাণী করা হয়। কোথাও ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যন্ত্রও বসানো হয়েছে। শহরের রাস্তাঘাটে পাখি দিয়েও ভাগ্য নির্ধারণের মিথ্যা অপচেষ্টা চলে। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী অত্যন্ত পরিস্কার, তিনি বলেন:

«من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم يُقبل له صلاة أربعين ليلة»

যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার কোনো সালাত কবুল হয় না।[18]

---

[17] . সূরা নামল: ৬৫।

عن ابى هريرة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা সত্য মনে করলো, সে মূলত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।”[19]

এর অর্থ হচ্ছে সে কাফির। আর তা এ জন্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে যে, গায়ব কেবলমাত্র আল্লাহ ই জানেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ ﴾ [الانعام: ٥٠]

বল, আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আমি গায়েবও জানি না। আমি তোমাদের এ কথাও বলছি না যে ,

---

[18] . আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিসাপূরী, সহীহ মুসলিম, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়াহ, ইসতাম্বুল, তা.বি, ৪ খ, পৃ. ১৭৫১।

[19] . আবু দাউদ, সোলাইমান ইবন আশ'আছ, সুনান আবী দাউদ, দারুল জীল, বৈরুত ১৯৯২, ৪খ, পৃ. ১৪।

আমি একজন ফেরেশতা। আমি অনুসরণ করি শুধু তাই যা আমার কাছে ওহী হয়ে আসে।[20]

নির্দিষ্ট তারকা নির্ধারিত স্থানে উদিত হলে তার প্রভাবে এই এই কল্যাণ বা অকল্যাণ হতে পারে, নির্ধারিত মৌসুমের প্রভাবে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে[21] প্রভৃতি যে সব কথা বার্তা আমাদের সমাজে অহরহ প্রচলিত রয়েছে তা পূর্বোল্লেখিত শির্কেরই অংশ বিশেষ।

৩.৩ জাদু:

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের কল্যাণেই সব কিছুর নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন। আগুন পোড়ানোর কাজে ব্যবহার হয়। পানি সব কিছু ভিজিয়ে দেয়, বাতাস গাছপালাকে দোলা দেয়, এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত নিয়মনীতি। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুর ব্যতিক্রম হলেই মানুষের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যেমন- আগুন ছাড়াই যখন কেউ কোনো কিছু পুড়তে দেখবে তখন কেন পুড়ছে? এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক। তখন মনের ভিতরে পোড়ার কারণ নিয়েই তোলপাড় শুরু হয়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি আগুনকে পোড়ানোর গুণ দিলেও আগুন

---

[20] সূরা আল আনআম:৫০।

[21] . প্র প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

ছাড়াই কোনো কিছু পোড়ানোর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তিনিই। নির্ধারিত নিয়ম লংঘন করে কোনো কিছু সংঘটিত হলে এটি কার দ্বারা হলো, যার প্রভাবে হলো তার সুত্র উদ্ধার করার একটি পর্যায় আমরা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে তার স্থানে বসাই, তখনই অলক্ষ্যেই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন ঔষধ ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়। আল্লাহ একে রোগ সারানোর গুণাগুন বা ক্ষমতা দান করেছেন। জাদু ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তারপরেও এর গুণাগুন যখন মানুষের উপর প্রভাব ফেলে তখনই এই অদৃশ্য বস্তুর প্রভাব ও ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন তোলপাড়, যার অনিবার্য পরিণতিতে আল্লাহতো বটেই এমনকি জাদুরও যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, এই ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, যা মূলত: শির্কের নামান্তর। সে জন্য ইসলামে জাদু কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুকেও উল্লেখ করেছেন।

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المو بقات قالوا يارسول الله وما هن؟ قال الشرك يالله والسحر---

সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বাঁচো। তারা বলল- সেগুলো কি কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শির্ক ও জাদু ....।[22]

জাদুকরদের কাছে কোনো রোগের চিকিস্যা বা সমস্যা সমাধানের আশ্রয় গ্রহণকেও ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়ছে। শুধু তাই নয়, কুরআন মাজীদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে জাদুকরদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার। মহান আল্লাহ বলেন, "বলো, ... ফুঁ দিয়ে গিরে কসে বাঁধে যেসব নারী, তাদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে, হে আল্লাহ তোমার কাছে পানা চাই।"

জাদুতে রয়েছে শির্কী কথাবার্তা। জাদু যার জন্য করা হয়, তাকেও শির্ক করতে বাধ্য করা হয়। সেজন্য জাদু শির্কেরই অংশ। বাংলাদেশে জাদু শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পত্রিকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। জাদু দ্বারা অসংখ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অনেকেই জাদুকর নামেই খ্যাতি অর্জন করেছে।

৩.৪ কবর পূজা:

---

[22] . আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৩৫০।

ইসলাম কবরের পবিত্রতা রক্ষা ও মৃত্যুকে স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা বৈধ মনে করে। তবে কবরে সিজদাহ, মানত, স্পর্শ করে বরকত হাছিল, চুমুদান, প্রদীপ জ্বালান, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতিকে ইসলাম শির্কের অংশ মনে করে। কবর সম্পর্কে ইসলামের বাণী অত্যন্ত পরিস্কার। বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।[23]

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরসমূহ চুনকাম করে

[23] . আবু-দাউদ, প্রাগুক্ত, ৩ খ, পৃ. ২১৩।

বাঁধাই করতে নিষেধ করেছেন।[24] এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মূলত: এর কারণ হচ্ছে, যিনি কবরের মধ্যে রয়েছেন, তাকে যেন কেউ ইবাদত না করে, সে পথ বন্ধকরণ। যেমন কুরতুবী (রহ.) বলেছেন:

وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها

এ সবকিছু এ জন্য যে, কবরে যিনি রয়েছেন, যাতে তিনি ইবাদতের মাধ্যমে না হন তার দরজা বন্ধ করা।[25]

কবরবাসীর কাছেও কোনো কিছু চাওয়া যেন আজ অনেকটা আমাদের সংস্কৃতিরই অংশ হিসাবে পরিণত হতে যাচ্ছে। এটিও পরিষ্কার শির্ক, এ থেকে মুসলিমদের মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কবর গাঁথা, কবরবাসীকে সম্মান দেখানোর লক্ষ্যে কবরে বাতি দান, পুষ্পমাল্য অর্পণ পার্থিব বিচারেও পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এর সামান্য কিছুও কি অস্থি মজ্জা বিলুপ্ত এই মৃতব্যক্তি উপভোগ করতে পারে? কক্ষণো নয়। এইসব কর্মকাণ্ড মূলত মৃতব্যক্তির প্রতি এমন

---

[24] . ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ. ৬৬৭।

[25] . শাঈখ, সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব, তায়সীবুল আযীযিল হাদীস ফি শারহি কিতাবিত তাওহীদ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রূপত ও দামিশক, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি।

অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে, যা ইসলাম কক্ষণো অনুমোদন করে না। এ ধরনের অকুণ্ঠ ভালবাসা মিশ্রিত সম্মান শুধু মহান আল্লাহই পেতে পারেন, যা মূলত তাকে ছাড়া অন্য কাউকে নিবেদন করা শির্কেরই নামান্তর। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, শাহাজালাল, খান জাহান আলী, বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ আল্লাহর অলীদের কবরকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পূজার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। এ সমস্ত জায়গায় যাওয়াকে মানুষ পুণ্যের কাজ মনে করে। এদেশের কবরস্থানে পাকা কবরের সংখ্য বেশি। এ দেশের পথে ঘাটে পীর, সুফী ও অলীদের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম যেমন: বদনা শাহ, ডাল চাল শাহ, শেয়াল শাহ, মিসকিন শাহ প্রভৃতি নামে গজিয়ে উঠেছে হাজার হাজার মাজার। এগুলো মূলত: এ দেশের মানুষদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার পথকে আরো উন্মুক্ত করেছে।

৩.৫ মূর্তি:

আদম আলাইহিস সালাম হতে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল মানুষই একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু كان الناس امة واحدة [26]আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام-

“আদম ও নূহ এর মধ্যে দশটি শতাব্দী সকলেই ইসলামের উপর অধিষ্ঠিত ছিল।”[27]

এরপর নূহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের দ্বারা শির্ক চর্চা শুরু হয়। তারা তাদের সমাজের প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মৃত্যুর পরে তাদের স্মরণার্থে তাদেরই প্রতিকৃতি বা মূর্তি স্থাপন করে। প্রথমতঃ এগুলোকে তারা এমনিতেই তৈরী করেছিল। তারা এগুলোকে সম্মানও দেখাত না, পূজাও করত না। তাদের সাধু সজ্জনদের মূর্তি বা প্রতিকৃতি বানায়ে এ সব সাধুজনদের নামেই তারা এগুলোর নামকরণ করেছিল। কিছুদিন পর শুরু হয় এগুলোর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন, যার অনিবার্য পরিণতিতে কিছুদিনের মধ্যে এগুলো পূজার বস্তুতে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বলা হচ্ছে:

---

[26] . সূরা আল-বাকারা: ২১৩।

[27] . ড. ছালিহ আল-ফাওযান, প্রাগুক্ত, ১ম মুদ্রণ, পৃ. ৩১।

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ۝٢٣ ﴾ [نوح: ٢٣]

"তারা (নূহের সম্প্রদায়) বলল- তোমরা কখনো তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর না। আদ্দ, সূওআ, ইয়াগুছ এবং য়া'উক ও নসরকেও পরিত্যাগ করনা।"[28]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র.) ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন:

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت-

"এগুলো (উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত নাম) নূহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের সজ্জন ব্যক্তিদের নাম। যখন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে তাদের বসার স্থানসমূহে তাদের প্রতিকৃতি বানাতে এবং এগুলোকে তাদের ঐ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করতে উপদেশ দিল। তারাও তা পালন করল। এরপর

[28] .সূরা নূহ: ২৩।

এই প্রজন্ম মৃত্যুবরণ করল এবং এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সকলে ভুলে গেল, তারপরই এগুলোর পূজা শুরু হল।”[29]

আল্লাহর একত্ববাদকে অপসারণ করার কুট-কৌশল হিসাবে শয়তান মূর্তিকেই ব্যবহার করেছিল এবং এই পৃথিবীতে শির্কের উদ্বোধন হয়েছিল এই মূর্তির মাধ্যমে, এ বিষয়টি এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং শির্ক হচ্ছে মূর্তি অপসংস্কৃতিরই ফসল। মূর্তি যে নামেই হোক, যে উদ্দেশ্যেই হোক তা জঘন্য শির্কেরই অংশ। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির ধরে রাখা প্রভৃতি যে কোনো উপলক্ষেই মূর্তি হোক না কেন, এটি জাজ্বল্য শির্ক। ইসলাম মূর্তি সংস্কৃতির সাথে কখনো আপোষ করেনি। বর্ণিত হয়েছে:

عن جرير بن حبان عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال أبعثك فيما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنى أن أسوى كل قبير وأن أطمس كل صنم-

“জারির ইবন হিববান তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় আলী (রা:) বলেছেন, আমি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাব, যেই কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি

---

[29] . আল-ইমাম আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যাতে সকল কবর সমতল করে দেই, আর সকল মূর্তি নিশ্চিহ্ন করে দেই।”[30]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সর্ব প্রথমেই কাবাঘরে সংরক্ষিত মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলেছিলেন।

عن ابن عباس رضى الله عنهما.... فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب فى يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى صنم منها بقى وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقى منها صنم إلا وقع-

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের তীর দ্বারা মূর্তিগুলোকে ইঙ্গিত করছিলেন এবং বলছিলেন-সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, নিশ্চয় মিথ্যা ধ্বংসশীল,[31] তিনি যে কোনো মূর্তির চেহারা ইঙ্গিত করছিলেন আর তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে পড়ছিলো। এমনিভাবে কোনো একটি মূর্তিও অবশিষ্ট রইল না।”[32] বিভিন্ন জায়গায় তিনি

---

[30] . আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৩, প্রথম মুদ্রণ, ১ম খ, পৃ. ১১২।

[31] . সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১।

[32] . ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন নববিয়্যাহ, দারুল ফিকর, কায়রো,তা. বি, ৩খ, পৃ. ১২৫৯।

মূর্তি ভাঙার জন্য সাহাবীদের পাঠিয়েছিলেন।[33] আমাদের দেশে স্বাধীনতার ভাষ্কর্যের নামে, জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে যে সব মূর্তি সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছে, তা হারাম কাজ হওয়ার পাশাপাশি যে কোনো সময় মানুষদেরকে শির্কে নিমজ্জিত করতে পারে।

স্মৃতিসৌধে ফুলদান, তার সামনে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দাড়িয়ে থাকাও স্পষ্ট শির্ক। কেননা এ দ্বারা এমন সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামে কেউ মারা গেলে বা শহীদ হলে তার কবর জিয়ারত করে তার জন্য দু'আ করা ব্যতীত তাকে শ্রদ্ধা জানানো বা তার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য কোনো কিছু করার সুযোগ নেই। এমনকি প্রতিকৃতিও ইসলামে বৈধ নয়।

عن أبى الهياج الأسدى: قال قال لى على رضى الله عنه الاأبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها-

"আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রা:) বলেন, আমাকে আলী (রা:) বলেছিলেন আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে

---

[33] . দেখুন হযরত আলী বর্ণিত হাদীস, আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে আলী (রা:) পাঠিয়েছিলেন? আর তা হচ্ছে, কোনো প্রতিকৃতির চিহ্ন মুছে ফেলা এবং কোনো উচু কবর সমতল না করা পর্যন্ত তুমি ক্ষান্ত হবে না।[34]

সুতরাং, বাংলাদেশে মূর্তি, প্রতিকৃতি ও স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি শির্কের অন্যতম মাধ্যম। এগুলো সবই হারাম।[35] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেখলেই এ বিষয়ে পরিষ্কার হয় যে, আমাদের এই জাতি বিভিন্ন নামে কিভাবে মূর্তির মতো এই শির্কের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটি মূলতঃ ব্রাক্ষ্মণ্যবাদি সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রভাব। বাসা বাড়ির শো-কেস গুলোতেও বিভিন্ন মূর্তির প্রতি ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ, যা মূলতঃ হারাম হলেও শির্কেরই মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

৩.৬ আগুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন:

একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম লাভের সময় পৃথিবীতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে:

---

34 . আল-ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২ খ, পৃ. ৬৬৬; আহমদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৯; ঈষৎ পরিবর্তনসহ আবু দাউদ, সোলাইমান ইবন আশ’আছ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২১২।

35 . আদ-দুআইশ আহমদ আব্দুর রাজ্জাক সংকলিত, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৭৯।

وخمدت النار التى يعبدها المجوس-

“অগ্নি উপাসকরা যে আগুনকে পূজা করত তা নির্বাপিত হয়।”36 এ বর্ণনায় এই কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরে অগ্নিকে অবিরত প্রজ্জ্বলিত রেখে তাকে পূজা করা অগ্নি উপাসকদেরই কাজ। মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আগুনের সাথে এই আচরণ মূলত শির্কের দিকেই মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ইদানিং ‘শিখা চিরন্তন’ ‘শিখা অনির্বাণ’ নামে যে অগ্নি সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, তা মূলতঃ অগ্নি উপাসকদের পক্ষ থেকে আগুনের প্রতি যে আচরণ করা হয়, তারই নামান্তর। উল্লেখ্য যে, ‘চিরন্তন’ শব্দটিও শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহই চিরন্তন, অন্যকিছু কক্ষনো চিরন্তন নয়। এরশাদ হচ্ছে:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

“পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল এবং শুধুমাত্র তোমার মহিমাময় মহানুভব রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।”[37] আল্লাহর জন্য নির্ধারিত

---

36 . আব্দুল ওয়াহহাব আত-তামীমী আন-নাজদী, মুখতাছিরু সীরাতির রাসূল, মাকতাবাতুল সুন্নাহ মুহাম্মাদিয়া, কায়রো, ১৯৫৬, পৃ. ১২।

37 . সূরা আর রহমান: ২৬-২৭।

কোনো গুণে তাঁরই সৃষ্ট কোনো কিছু গুণান্বিত করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। সেই প্রেক্ষিতে অগ্নিশিখাকে চিরন্তন নামকরণও প্রকাশ্য শির্ক। সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো, জন্মদিন উদযাপনে মোমবাতির আগুন, বিয়ের হলুদেও বাতির ব্যবহার, কবর, দরগাহ প্রভৃতি স্থানে আগুন জ্বালানো, এগুলো বিদ‘আত ও হারাম হওয়ার সাথে সাথে শির্কেরই দিকে মানুষদের পরিচালিত করছে। কোনো কোন জায়গায় মৃত ব্যক্তির গোসলের স্থানেও রাত্রিতে দীর্ঘদিন বাতি জ্বালিয়ে রাখাও এই অপসংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত।

৩.৭ প্রদর্শনেচ্ছা:

কাউকে খুশী করা, কারো প্রশংসা বা বাহ বাহ কুড়ানোর জন্য অনেকেই অনেক ভাল কাজ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে ছাওয়াবের নিয়তে যে কোনো ভাল কাজ করা ইবাদতেরই অংশ। আর ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তাই হচ্ছেন, মহান রাব্বুল আলামীন। যে জন্য যে সকল ভাল কাজের সামান্য হলেও প্রদর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তা মূলত: পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় না বরং অন্যকে খুশী করা, অন্যের থেকে প্রশংসা পাওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য সেখানে কিঞ্চিত হলেও থাকে

বলে প্রদর্শনেচ্ছা জড়িত যে কোনো কাজই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন:

الا أخبر كم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفى يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.

আমি কি এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জালের চেয়ে আরো ভয়াবহ একটি বিষয়ে তোমাদেরকে সংবাদ দেব না? সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ, তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে গোপন শির্ক।' কোনো ব্যক্তি ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াল আর তা অন্য মানুষের দৃষ্টিতে ভাল প্রমাণের জন্য সুন্দর করে আদায় করল।[38] অর্থাৎ নিজে সাধারণত: যে ভাবে ছালাত আদায় করা হয় অন্য কেউ তা দেখছে বিধায় তা আরো সুন্দর করে, আদায় করা, ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন:

انا اغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا لشرك فيه غيري تركته وشركه

---

[38] . ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৪থ, পৃ. ২২৮৯।

আমি শির্কযুক্ত আমল (কাজ) থেকে মুখাপেক্ষীহীন। যে কেউ কোনো কাজ করল এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার বানাল, আমি ঐ কাজ ও যাকে অংশীদার বানাল উভয়কেই বর্জন করি।[39]

আমাদের সমাজে লোক দেখানোর জন্য দান করা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, অন্যের উপকার করা, হাজী বলা হবে বলে হজ্জ করা, খ্যাতির জন্য যে কোনো কাজ করা প্রভৃতি অনবরতই হচ্ছে। এ গুলো শির্কের অন্তর্ভুক্ত**।** কিয়ামতে এই কারণেই অনেক দানবীর, শহীদ ও আলিমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[40]

৩.৮ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে দো'আ:

ভাল-মন্দ, বাঁচা-মরা, সন্তান দান, চাকুরী পাওয়া, জান্নাত প্রাপ্তি, গোনাহ মাফ, এইসব কিছু দেওয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সেজন্য এই সব চাওয়া বা এ সম্পর্কে

[39]. ইবন মাজাহ্, মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ আল-কাযবিনী, সনান ইবন মাজা, রিয়াদ, ১৯৮৪, ২য় মুদ্রণ, ২খ, পৃ. ৪২৬।

[40] . আত-তিরমিযী, আবু' ঈসা মুহাম্মদ, সুনানুত, তিরমিযী, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী', তা.বি, ৪ খ, পৃ. ৫৯১-৫৯৩।

অন্য কারো কাছে দো'আ করাকে আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে- মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ ﴾ [يونس: ١٠٦]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা তোমার কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখেনা তাদের কাছে কোনো কিছুর প্রার্থনা করবে না, যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[41]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ ﴾ [فاطر: ١٣]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যের কাছে চায়, তারা তো খেজুরের বিচির উপরের পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।[42]

সুতরাং সবকিছু দেওয়ার একচ্ছত্র মালিকই হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চাওয়া মূলত: তারই নির্ধারিত অধিকারে অন্যকে অহেতুক অংশীদার বানানো হয় বলে আল্লাহ

---

41 . সূরা ইউনুস: ১০৬।

42 . সূরা ফাতির: ১৩।

ব্যতীত অন্যের কাছে কিছু চাওয়া, এমনকি কোনো নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চাওয়া বা দো'আ করা জাজ্বল্য শির্ক। বর্ণিত হয়েছে:

روى الطبراني بإسناده إنه كان فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে একজন মুনাফিক মুমিনদেরকে কষ্ট দিত। কেউ কেউ বললেন, চলুন আমরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে এই মুনাফিক হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ধরণের মুক্তি আমার থেকে চাওয়া উচিত নয়, বরং তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।[43]

আমাদের দেশে মৃতব্যক্তি, অলী, পীর, মুরুব্বী, খাজা, প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে চাওয়ার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা স্পষ্ট শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত। কোনো কারো অসীলাহ দিয়ে আল্লাহর কাছে

---

[43]. আত-তাবারানী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে, ইবন তাইমিয়া, শায়খুল ইসলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, ১ খ, পৃ. ১০১।

কিছু চাওয়াও শির্ক বলে গণ্য হয়। কেননা কোনো কিছু চাওয়ার নিয়ম যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ ٦٠ ﴾ [غافر: ٦٠]

"এবং তোমাদের রব বলেছেন- আমার কাছে চাও, আমি তা দেব।"[44]

সুতরাং বান্দা তার রবের কাছেই চাইবে। অন্য কারো অছিলায় চাওয়া মূলত: এ প্রসঙ্গে আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার যেমন খর্ব হয়, তেমনি অন্যকেও এ কাজে জড়িয়ে ফেলা হয়, সে জন্য এটি শির্কেই নামান্তর।

৩.৯ তাবীজ ব্যবহার

রোগমুক্তি, উদ্দেশ্য হাছিল, কারো কুনজর থেকে বেঁচে থাকা, প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে তাবীজ ঝোলানো হয়, তাও মূলত: এক প্রকার শির্ক। উকবাহ ইবন আমরের সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[44] . সূরা মু'মিনুন:১৩।

ان الرقى التمائم والتولة من الشرك

নিশ্চয় মন্ত্র, তাবিজ ও যা স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর নিকট প্রিয় করে তোলার জন্য নেওয়া হয়, তা ব্যবহার করা শির্ক।[45]

সমস্যা সমাধান, বিপদমুক্তি, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, উদ্দেশ্য হাছিল প্রভৃতি করতে আমাদের দেশে যে আংটি রিং, সুতা পড়া, গাছ বা তৃণের অংশ, কড়ি প্রভৃতি ঝুলানো হয় তা মুলত: এই শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত।[46] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি রিং পরানো দেখে বলেছিলেন:

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهى عليك ما افلحت ابدا.

তুমি এটি খুলে ফেল, কেননা এটি তোমাকে দুর্বল থেকে আরো দুর্বল করবে, আর যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তাহলে তুমি কখনো মুক্তি পাবে না।[47]

কুরআনের অংশ বিশেষ লিখিত তাবীজ ব্যবহার বৈধ কিনা এ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন আমর

---

45 .আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, ৪র্থ, পৃ. ১৫৪।

46 . ড. ছালিহ আল-ফাওযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

47 . ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, ২য়, পৃ. ২৮৫।

ইবনুল আস, আয়িশাহ (রা.), আবু জাফর আল বাকির ও ইমাম আহমদ(রা.) এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী এটি ব্যবহার বৈধ। তারা পূর্বে উল্লেখিত যে হাদীসে তাবীজ কে শির্ক বলা হয়েছে তা শুধু মাত্র কুরআন ব্যতীত অন্যান্য শির্কী তাবীজকে বুঝান হয়েছে বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে আব্দুলাহ ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস (রা.), হুযাইফা, উকবাহ ইবন আমির, ইবন আকিম (রা.), তাবিঈদের একটি দল, ইবন মাসউদের ছাত্ররা ও ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা অনুযায়ী কুরআনের অংশবিশেষ লিখিত তাবীজও অবৈধ। তাদের মতে হাদীসে যেহেতু কুরআনের অংশ বিশেষ অথবা অংশবিশেষ নয়, এমন কোনো পার্থক্য না করেই সকল প্রকার তাবীজকে শির্ক বলা হয়েছে সেহেতু যে কোনো প্রকার তাবীজ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।[48]

আমাদের দৃষ্টিতে যদি কোনো মুর্তিকে পূজা নাও করা হয়, তাহলেও তা শির্কের মাধ্যম হওয়ার কারণে ভেঙ্গে ফেলাই ইসলামের নির্দেশ। সে জন্যই তাবীজ শির্কের মত স্পর্শ কাতর বিষয়ের দিকে ব্যবহারকারীকে নিতে পারে, এই কারণে কুরআনের অংশবিশেষ লিখিত তাবীজও বর্জনীয়। অন্য দিকে যেহেতু এটি সংশয় পূর্ণ সেহেতু এটি বর্জন করাও হাদীসের অনিবার্য শিক্ষা। বর্ণিত হয়েছে:

[48] . শাইখ সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

«الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرا لدينه وعرضه، و من وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يو شك أن يو اقعه»

“যা হালাল তা সুস্পষ্ট। আর যা হারাম তাও সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থান করছে সন্দেহপূর্ণ বিষয়সমূহ, যা অনেকেই জানে না, যে এই সকল সন্দেহ পূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দীন ও সম্মানকে হেফাজত করল। আর যে এই সন্দেহ পূর্ণ বিষয়ে পতিত হল, সে ঐ রাখালের মত যে তার পশুকে সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্বেই চরায়, আর সে কারণেই সেখানে প্রবেশের আশংকা থাকে।[49]

খাদ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্যম, তেমনি ঔষধ রোগ মুক্তির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হওয়াকে শরিয়াত অনুমোদন দিয়েছে। তবে ঔষধই রোগ মুক্ত করে, এই বিশ্বাসে ঔষধ ব্যবহারও মূলত: শির্কের অন্তর্ভুক্ত। ঔষধ ব্যবহারের সময় এটি একটি মাধ্যম মাত্র, আরোগ্য দানের মালিক আল্লাহ এই বিশ্বাস লালন করা অপরিহার্য। এজন্য ঔষধ

[49]. ইমাম আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ খ, পৃ. ২৬।

খাওয়ার সময় দো'আ শিখানো হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহই রোগ মুক্তিদাতা।[50]

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সাধকদের চ্যালেঞ্জের নামে অহরহ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হচ্ছে, এসব বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই কথাই বোঝানো হয় যে, চাকরী না পাওয়া, মামলায় পরাজিত হওয়া, সন্তানলাভ না করা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ প্রভৃতি জটিল সমস্যাও যেন ঐ সব সাধকগণ সমাধান করে থাকেন। আসলে এসব সমস্যার সমাধানকারী আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মনে করা শির্কেরই নামান্তর।

৩.১০ বরকত হাছিল:

গাছ, পাথর, কবর, বিশেষ স্থানের ধুলা বা মাটি, কাবার গেলাফ, বাগদাদের বিশেষ বিশেষ জিনিস প্রভৃতির মাধ্যমে বরকত লাভের নিয়ম আমাদের দেশে বেশ প্রচলন রয়েছে। বরকতের বিশ্বাস ক্রমশ: মানুষকে উক্ত জিনিস উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখে, এই বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়, যা মূলত: শির্কের অপর নাম।

---

[50] . ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ৪ খ, পৃ. ১৭২২।

বরকতদানের একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অথবা তার সাথে অন্য কিছুকে বরকতের মালিক মনে করে ঐ সব থেকে বরকত হাছিল করা মূলত: শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত। তিরমিযী শরীফে আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা একটি নির্ধারিত বরুই বৃক্ষ হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বরকত গ্রহণ করত। আমরাও যাতে এরূপ বরকত গ্রহণ করতে পারি সেজন্য একটি গাছ নির্ধারণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন:

«الله أكبر، إنها السنن ---»

আল্লাহই সবচেয়ে বড়। এটাই রীতি-নীতি, তোমরা তাই বললে, যা বনু ইসরাঈল মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল। আপনি ওদের যেমন ইলাহ রয়েছে তেমনি আমাদের জন্য ইলাহ নির্ধারণ করে দিন।” তিনি বললেন, ‘তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়।’ তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের রীতি-নীতির উপরই চলছ।”[51] এই হাদীসে বরকতের জন্য কিছুকে নির্ধারণ করাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন। যাই হোক আল্লাহ ব্যতীত

---

[51] . আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৪৭৫।

অন্য কিছু বা অন্য কেউ হতে বরকত হাছিল করা মূলত: শির্ক করারই শামিল।

৩.১১ শুভ ও অশুভ বিশ্বাস:

কোনো কাজ শুরু করতে, ভ্রমণে বের হতে, বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দিন নির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শুভ অশুভ দেখার প্রচলনও আমাদের দেশে রয়েছে। আগে পাখীর মাধ্যমে এই শুভ অশুভ নির্ধারণ হত। পাখী ডানের দিকে উড়ে গেলে শুভ, অন্যথায় অশুভ ধরে নেয়া হত। ইসলামের দৃষ্টিতে শুভ অশুভ নির্ধারণের এই পদ্ধতি এবং এর প্রতি ঈমান আনা শির্ক। কেননা এটি একদিকে আল্লাহর প্রতি মানুষের আস্থা ও তাওয়াকুলকে বিঘ্নিত করে, তেমনই মঙ্গল ও অনিষ্টতা করার অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর, সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিন বার বলেন:

الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا

পাখী উড়িয়ে শুভ অশুভ নির্ধারণ শির্ক।[52] আসলে মঙ্গল অমঙ্গল শুভ-অশুভ মহান আল্লাহরই বিষয়। কোনো সৃষ্টের মাধ্যমে তা নির্ধারণ মূলত: তাঁরই কর্তৃত্বে অন্যকে অংশীদার বানান হয়, সেজন্য এটি শির্ক। কাকের ডাক, যাত্রা পথে ভাঙা বা ছেড়া কোনো কিছু দেখা, কলা বা ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া, বন্ধ্যার মুখ দর্শন, খালী কলস দেখা প্রভৃতিকে অশুভ মনে করার যে প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে তা শির্কেরই নামান্তর।

৩.১২ কদমবুছির হুকুম

আমাদর দেশে পীর দরবেশ, বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী, উস্তাদকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কদমবুছি করা হয়। কিন্তু এটা জায়েয হবার ভিত্তি খুবই দুর্বল। তাছাড়া কদমবুছি হল, সম্মানের মধ্যে অতিরঞ্জিত করা যা শির্কের আহ্বায়ক। সর্বসিদ্ধান্ত মাসআলা হল, ‘সম্মানে অতিরঞ্জিত করা, শির্কের আহ্বায়ক, আর শির্কের আহ্বায়ক হারাম, আর হারামের আহবায়কও হারাম। তাই শির্ক যেহেতু হারাম, তার আহ্বায়কও হারাম, বিধায় উক্ত শির্ক ও হারাম মিশ্রিত কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিম ও ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত জরুরী তথা

---

[52] . আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৪ খ, পৃ. ১৬।

ওয়াজিব। অন্যথায় ক্রমান্বয়ে ইহা সিজদার সাথে সামঞ্জস্যমান হয়ে যাবে, বর্তমান যমানায় যার প্রমাণও পরিলক্ষিত হয়।

কদম্বুছি বা পা চুম্বন কিছু কিছু আলেমগণের নিকট জায়েয হলেও অনেক ফেকাহবিদগণের নিকট তা জায়েয নয়। ফেকাহবিদগণের নিয়ম ভিত্তিক সর্বসিদ্ধান্ত মাসআলা হল জায়েয এবং নাজায়েযের মধ্যে মত বিরোধ হলে নাজায়েযই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। সুতরাং তাকে কেউ জায়েয বললেও নিয়মভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে তা না করাই ভালো, বরং তা বিদ'আতের বেশি নিকটবর্তী।

জানা আবশ্যক যে, অফদে আব্দুল কায়েছ এর হাদীস উপস্থাপনে যারা কদমবুছিকে জায়েয বলেন, তার উত্তর হল- সেই হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়া সাপেক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই নির্দিষ্ট। অন্য কারও জন্য তা কোনো সাহাবী করেছেন বলে প্রমাণিত হয় নি। আর শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরীয়ত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুওয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি থেকে বাঁচাবার এমন প্রতিটি ছিদ্র পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শির্ক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে না পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে সব বিষয়ও এ শরীয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী

কোনো যুগে শির্ক ও মূর্তিপূজার উৎস বা কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কণ এবং তার ব্যবহারও এজন্য হারাম করা হয়েছে। আর এমন সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শির্কের সামঞ্জস্য না হয়ে দাঁড়ায়। একই কারণে কদমবুছিও জায়েয হবে না।

তাছাড়া কদমবুছির মাধ্যমে শরীয়ত অনুমোদিত সালাম বাদ পড়ে যায়। কারণ একটি বিদ'আত চালু হলে একটি সুন্নাত বাদ পড়ে যায়।

৩.১৪ জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে ভ্রূণ হত্যা

আমাদের দেশে সরকারীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে, তাছাড়া দুর্ভিক্ষজনিত কারণে এবং অভাব অনটনের স্বীকার হয়ে অনেকে ইহা অবাধে গ্রহণ করছে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের নির্দেশ মোতাবেক জ্ববতে-তাওলীদ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম। রিজিকের স্বল্পতার ভয়ে চাই পুরুষ হউক বা মেয়ে, বিবাহিত হউক বা অবিবাহিত, জোয়ান হউক বা বৃদ্ধ- ইনজেকশনের দ্বারা হউক বা ঔষুধের দ্বারা অথবা খাসির দ্বারা হউক

সর্বাবস্থায়ই তা হারাম। তা মহান আল্লাহর কুদরতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করারই নামান্তর এবং প্রভুর উপর ভরসা না করে নিজের বাহু বলের উপর ভরসা করা। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

﴿ ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا ﴾ [هود: ٦]

"যমীনে যা কিছু বিচরণ করছে, সব কিছুর রিজিক আল্লাহর নিকট (সূরা হুদ ৬)

অন্য জায়গাতে আছে,

﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا ٣١ ﴾ [الاسراء: ٣١]

"আর দারিদ্রতার ভয়ে ছেলে সন্তান নষ্ট করো না, কারণ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিজিক আমিই দান করি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মস্তবড় অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাঈল:৩১)

আলোচ্য কুরআনের আয়াত এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। হাদীস শরীফের মধ্যে আছে- দুর্ভিক্ষ আর প্রশস্ততা, মানুষের লগিষ্ঠতা আর গরিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা মানুষের নাফরমানী ও আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। পূর্ণ আনুগত্য পাওয়া গেলে প্রশস্ততা বেড়ে যাবে।

আর যদি নাফরমানী বৃদ্ধি পায় তাহলে দুর্ভিক্ষ, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি রকমারী আজাব শুরু হয়ে যাবে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস শরীফ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক নাফরামানীই দুর্ভিক্ষজনিত আজাবের কারণ। কেননা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার জন্য তা বড় মাধ্যম। গর্ভধারণজনিত ভয় থেকে যখন মানুষ নিরাপদ হবে, তখন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোনো চিন্তাই করবে না। আর এ অপকর্মের ফল সকলের সামনেই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এ কারণেই বিভিন্ন অপ্রতিষেধক রোগ, খরা, অতিবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ একের পর এক মানুষের জীবনকে অস্থির করে রেখেছে। রাষ্ট্রীয় উন্নতি এবং দুনিয়ার চাকচিক্য মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরই নির্ভর করে সংখ্যালঘুর উপর নয়। ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতের উন্নতি ও পুত পবিত্র সংখ্যাধিক্য মানুষের উপর নির্ভর করে। তা মানুষের এক বিরাট খনি সদৃশ্য।

আজল এবং জবতে তাওলীদ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে অনেক ব্যবধান। জন্মনিয়ন্ত্রণ সর্বাবস্থায়ই হারাম আর আজল শরীয়ত সম্মত জরুরতের কারণে জায়েয। আর জরুরত ব্যতীত মাকরুহ। হাদীসের আলোকে আজল গোপন হত্যারই নামান্তর।

উক্ত হাদীসের দ্বারা আজলও অপছন্দনীয় বলে মনে হয়। উক্ত নিয়ম ভিত্তিক প্রয়োজনের তাকিদে ফোকাহায়ে কেরামগণ শুধু আজল করাকে জায়েয বলেছেন। প্রয়োজন ব্যতীত খারাপ উদ্দেশ্যে আজল বিনা সন্দেহে মাকরূহ। গর্ভ নষ্ট করা যে নাজায়েয তা নিম্নের হাদীস শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন-

"ঐ সমস্ত মেয়েদের বিবাহ কর, যারা নিজ স্বামীকে মুহাব্বত করে এবং অধিক প্রজননশীল হয়। কেননা তোমদের আধিক্যতার উপর ভিত্তি করে আমি অন্যান্য উম্মতের মোকাবেলা গর্ব করতে পারব।" সুতরাং সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং তার প্রচার প্রসার করা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৩.১৪ বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক গ্রহন

বর বা অন্যান্য মানুষের চাপে কনে পক্ষ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন কনের জেওর, কাপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদিসহ অতিরিক্ত টাকা গ্রহন বৈধ নয়। বরং এটি এক প্রকার জুলুম। এ ধরনের সংস্কৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে দেখা যেত।

যদি বর বা তার গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে এমন শর্ত করা হয় যে কনে বা তার গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে হাদিয়া তুহফা বা টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপঢৌকন না দিলে, উক্ত কনেকে বিবাহই করবে না, তাহলে শর্ত সাপেক্ষে কনের পক্ষ থেকে উক্ত জিনিসপত্র দেওয়া সুদ হিসেবে হারাম হবে। চাই তা নিজের দিক বা অন্য কারো কাছ থেকে নিয়েই দিক। কেননা বিবাহ বন্ধন হল এমন একটি বেচা-কেনা যেখানে বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় না। যেমন- অন্যান্য বেচা-কেনার টাকার বিনিময়ে কাপড়, ধান ইত্যাদি কোনো বস্তু পাওয়া যায়। তাই বিবাহ নামক বেচা-কেনার মধ্যে শরীয়তের দাবী (যেমন মহর ইত্যাদি) ব্যতীত যে কোনো পক্ষ থেকে টাকা-পয়সা দেওয়া ও নেওয়া ঘুষ হিসাবে হারাম হবে।

আর বিবাহের পূর্বে, মেয়ের পিতা ছেলের অসন্তুষ্টিতে, তার নিকট থেকে দাবীর মাধ্যমে যে টাকা গ্রহণ করে, তাও সুদ। হ্যাঁ ছেলের নিকট দাবী করা ব্যতীত সে সন্তুষ্টচিত্তে যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা জায়েয হবে।

বিবাহ মজলিসে বরকে হাদিয়া তোহফার নামে বিভিন্ন জিনিস দেওয়ার যে রেওয়াজ রয়েছে, যদিও তা শর্ত ব্যতীত হোক না কেন, মাকরূহে তাহরিমী। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী শরহে মেশকাতের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

অনেক জায়গার মধ্যে বিবাহের প্রথা রয়েছে যেমন বিবাহের মজলিসে বরকে উপস্থিত মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে সালাম করানো হয়। ইহাও এক প্রকার রেওয়াজ ও গোনাহ। হ্যাঁ প্রথম সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নত। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। আবার অনেক জায়গাতে বিবাহ মজলিস থেকে পানের বাটা ঘরে প্রেরণ করা হয়। ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় পানের বিনিময়ে যা টাকা উসুল করা হয়, তা আবার বরের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। ইহা আসলে হাদিয়া নয় একটি রেওয়াজ মাত্র। হাদিয়ার নামে যে টাকা দেয়া হয় তা খুশী মনে দেয়া হয় না। বরং নিজের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার ভয়েই দেয়া হয়। তাই জাতীয় কুসংস্কার জায়েয হবে না। কেননা সন্তুষ্টচিত্ত ব্যতীত একজনের মাল-সম্পদ অপরের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে বিবাহের দিন বরকে খাট পালং, ঘড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন আসবাবপত্র দেওয়ার প্রচলনও না জায়েয। আবার বরকে ঘরে নিয়ে ঘরের চতুর্দিক থেকে মেয়েরা তাকিয়ে দেখা, তা কবিরাহ গোনাহ। এমনিভাবে অপরিচিত বা পরিচিত গায়রে মোহরেম (যাদেরকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয) মেয়ে লোক বরের সামনে আসা, মেয়ে লোক বরের সামনে গান গাওয়া ও মালা পরানো এবং তার বিনিময়ে টাকা আদায় করা সম্পূর্ণ গুনাহের কাজ। মেয়েদের জন্য মেহেন্দি লাগানো মুস্তাহাব। পুরুষের জন্য হারাম। কেননা তা হল সাজসজ্জার উপকরণ। আর সাজসজ্জা হল মেয়েদের

জন্য। তা পুরুষের জন্য নয়। তেমনিভাবে স্বর্ণের আংটি এবং অন্যান্য জেওর পুরুষের জন্য হারাম। শরীয়তে এ জাতীয় লেনদেনের কোনো ভিত্তি নেই। আবার যা দেয়া হয় তা খুশীতে নয় বরং সম্মান রক্ষার্থে এবং রেওয়াজ টিকিয়ে রাখার জন্যই দেয়া হয়। আর অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে জোর যরবদস্তির মাধ্যমে যা আদায় করা হয় তা সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। কারণ তা হলো এক প্রকার ডাকাতি বরং তার চেয়েও মারাত্মক।

৩.১৫ আনুষ্ঠানিকতার নামে অপব্যয়

আনুষ্ঠানিকতার নামে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। তা অপব্যয়ের মধ্যে শামিল, আর অপব্যয় অকাট্য দলিলের দ্বারা হারাম প্রমাণিত। যেমন-মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧ ﴾ [الاسراء: ٢٧]

“অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অস্বীকারকারী।” মনের কুপ্রবৃত্তির সন্তুষ্টির জন্য টাকা-পয়সা খরচ করা এবং গোনাহের কাজে খরচ করা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক জায়গায় বরের বাড়ী থেকে, কনের বাড়ীতে, আবার কনের বাড়ী থেকে, বরের বাড়ীতে মেহেন্দি পাঠানো হয় এবং অপরিচিত বা পরিচিত গায়রে মুহরেম মেয়ে বরের হাত ধরে মেহেন্দি লাগায়। যা সম্পূর্ণভাবে হারাম। এ সমস্ত মানুষের আমালনামায় জেনার গোনাহ লেখা হবে। তাছাড়া গান গাওয়া ও বাদ্য বাজানো সম্পূর্ণ হারাম। বস্তুত: গান বাদ্য নেফাক সৃষ্টি করে এবং খাহেশ বৃদ্ধি করে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

জানা আবশ্যক, বিবাহকারী উভয়পক্ষে সমস্ত কথাবার্তা ঠিক হওয়ার পর প্রয়োজনে কনেকে অতি গোপনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে দেখে নিতে পারে। দেখার ব্যাপারটি সমাজে প্রকাশ করা ঠিক নয়। কারণ, হতে পারে কোনো অসুবিধায় বিবাহ নাও হতে পারে। কিন্তু এ দেখাকে উপলক্ষ্য করে অন্য পাত্র উক্ত মেয়ের জন্য আসতে চাইবে না। তাতে মেয়ের গার্জিয়ানের অনেক কষ্ট পেতে হয়। দ্বিতীয় জায়গায় বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে খুব বুঝা দরকার। নির্ধারিত বর ব্যতীত অন্য যে কোনো পুরষ উক্ত মেয়েকে দেখতে পারবে না। কারণ, তখন তিনি ঐ মেয়ের জন্য গায়রে মুহরেম। বেশীর পক্ষে এতটুকু করা যেতে পারে বরের কোনো মুহরেম মেয়ে মাতা, বোন বা ফুফু ইত্যাদি মেয়েদেরকে, অতি গোপনে কনের বাড়ী পাঠিয়ে দেখে নিতে পারে। তাও আবার বিবাহের পূর্বে সমাজে প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

বরকে গোসল দেওয়ার সময় কতগুলি হিন্দুয়ানী রুছুম করা হয়। যেমন- কুলা ইত্যাদিকে সাজিয়ে এর মধ্যে মোমবাতী জ্বালানো, ধান, হলুদ ইত্যাদি দেওয়া সবই নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ। আবার কনেকে বরের বাড়ী নিয়ে নামানোর পূর্বে অজ্ঞ মানুষেরা কিছু রুছুমাত করে থাকে। যেমন- কনের নামনে পানি রাখা, কলসি রাখা ইত্যাদি সবই নাজায়েয এবং হিন্দুদের তরিকা-

বিবাহের মধ্যে আরো একটি কুসংস্কার হল কনের নিকট থেকে এজাযত নেয়ার সময় কয়েকজন গায়রে মুহরেম পুরুষও অলির (গার্জিয়ানের) সাথে থাকে। যা ঠিক নয় এবং এর প্রয়োজনও নেই।

কেননা ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এজাযত নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। আর তা হলো, কনে যদি বালেগ হয়ে থাকে তাহলে তার ওলি (পিতা, ভাই অথবা দাদা) যিনি হবেন, তিনি তাকে শুধু শুধিয়ে দিবেন যে, আমি তোমাকে অমুকের ছেলে অমুকের নিকট এত টাকার (মাহরের) বিনিময়ে বিবাহ দিতে চাই। এটা শ্রবণে কনে যদি কাঁদে, হাসে বা চুপ করে থাকে তাহলে তা সন্তুষ্টি হিসেবে ধর্তব্য হবে। উক্ত অবস্থায় সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই। বিবাহ সম্পাদনের সময় শুধু সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পাদন হবে না। আর যদি কনে নাবালেগই হয়, তাহলে তার এজাযত ব্যতীতও তার পিতা অথবা দাদা বিবাহ দিতে পারে।

আরো একটি কুসংস্কার হল, কনেকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ঘরে প্রবেশের সময় বর এবং কনে উভয়েই কাঁচা মাটিতে পা রেখে প্রবেশ করতে হয়। শরীয়তে এ সমস্ত কাজের কোনো ভিত্তি নেই। এছাড়াও উভয়ের কাপড়ের মধ্যে গিরা লাগানো হয়। দাম্পত্য জীবনে মিল মুহব্বত নাকি ইত্যাদি সুবিবেক বিরোধী কাজের উপর নির্ভর করে। ধিক এ সকল অজ্ঞতার উপর। এগুলো সবই বিধর্মী ও হিন্দুয়ানী প্রথা বৈ কিছু নয়। কেউ মূর্খ সমাজের চাপে, আবার কেউ আত্মীয়তার আবদার বজায় রাখার জন্য করে। ধর্মীয় সুষ্ট ও সুন্দর নিয়মের মোকাবেলায় এ সমস্ত কুসংস্কার ও বিবেক বিরোধী কাজের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ সকলকে ধর্মের সঠিক বুঝ নছিব করুন এবং ধর্মীয় নির্ধারিত বিধান সঠিকভাবে পালন করার তাওফিক নছিব করুন।

৩.১৬ আকিকার বদ রুছুম

আমাদের দেশে আকীকার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কুসংস্কার রয়েছে, যেমন:

আকিকার গোশত পিতা-মাতা খেতে পারে না। ঐ দিন প্রচলিত মিলাদ পড়ানো এবং মিলাদ পাঠকারীদেরকে এর বিনিময়ে টাকা-

পয়সা দেওয়া, আকিকার দিন রাত্রে বাচ্চার দীর্ঘায়ূর জন্য এবং সম্পদের উন্নতির জন্য, তার হাতে কলম দেওয়া এবং এবং কিছু টাকা ও রৌপ্য ইত্যাদি দিয়ে তাকে লেখানো চেষ্টা করা হয়। অথচ এসব আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং এমন আকিদা রাখা কখনও কখনও শির্ক হয়ে যায় আবার কখনও কখনও নিরেট বিদ'আত।

আকিকার গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায়। তাই ধনী-দরিদ্র সকলেই তা ভক্ষণ করতে পারে। তবে চামড়া ছদকা করা ওয়াজিব। আকিকা করা সুন্নত জন্মের সপ্তম দিবসে, ছেলে হলে দুটি বকরি, আর মেয়ে হলে একটি বকরি দ্বারা আকিকা করতে হয়। আর যদি সম্ভব না হয় ছেলের জন্য একটি বকরি দ্বারা আকিকা করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। আকীকার দিনই মাথার চুল কামানো সুন্নত। চুলের ওজর পরিমাণ রৌপ্য ছদকা করা মুস্তাহাব। আকীকার প্রাণী যে কোনো সময় জবেহ করা যায়, তবে চুল কামানোর পর জবেহ করাই উত্তম।

জন্ম তারিখ হিসাবে প্রতি বছর ঐ তারিখে মিলাদ মাহফিল করা এবং মানুষকে খানা খাওয়ানো যেমন কুসংস্কার, এ জাতীয় খানা খাওয়াও ঠিক না। যেমন মৃত ব্যক্তির নামে প্রতি বছর আয়োজনকৃত

খানা খাওয়া ঠিক নয়। যা মারাত্মক বিদ‘আত এবং মাকরূহ। যা ওরুস নামে প্রসিদ্ধ।

এমনিভাবে মানুষের নিকট থেকে চাল, ডাল, টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল ইত্যাদি ফকিরের মত ভিক্ষা করে খানা পাকানো, শিরনি পাকানো এবং মানুষকে খাওয়ানো। আর এ সব কাজ করাকে বালা মছিবত দূরীভূত হওয়ার বিশ্বাস রাখা। এ জাতীয় শরীয়ত গর্হিত কাজের দ্বারা বালা মসিবত বিদূরীত হয় না; বরং তা শরীয়ত বিরোধী কাজ হওয়ার কারণে বালা-মুছিবত আনার বড় কারণ। বালা, মুছিবত, বিদুরীত হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফের বর্ণনা হল-অধিক পরিমাণে এস্তেগফার পড়া, দরূদ শরীফ পড়া, নফল ছদকা করা, অধিক নফল নামায পড়া, খালেছ তওবা করা ইত্যাদি।

৩.১৭ খতনার বদ রুছুম

খতনা সম্পর্কে আমাদের দেশে যে প্রথা প্রচলিত আছে যেমন খতনার সপ্তম দিনে তার (ছেলের) মাথার চুল কেটে গোসল দিয়ে ভাল ভাল কাপড় পরিধান করিয়ে দুলার মত সাজানো হয়। তারপর আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয় উক্ত দাওয়াতে আংটি, কাপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের থেকে আদায় করা হয়। বিনিময়ে আমন্ত্রণকারী গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই করে মেহমানদারী

করেন। এগুলি সবই শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। কেননা শরীয়তে এ জাতীয় কাজের কোনো অস্তিত্ব ও ভিত্তি নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনগণও ছেলে সন্তানের খতনা করাতেন। তেমনিভাবে ওলি বুজুর্গণও ছেলে সন্তানের খতনা করাতেন। কিন্তু তাকে উপলক্ষ করে এ জাতীয় কুসংস্কারমূলক কাজ কোনো দিনই করেননি। তাদের থেকে এসবের প্রমাণ না হওয়া বেদআত হওয়ার বলিষ্ঠ দলিল। তাছাড়াও এ জাতীয় কাজগুলো করা হয় শুধু নাম ও যশের জন্য, ইখলাসের পন্ধও তাতে পাওয়া যায় না। আর উপঢৌকন হিসাবে যা কিছু পেশ করা হয় তা শুধু নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখার নিমিত্তেই পেশ করা হয়। এক পেট খেয়েছে এদিকে অন্যান্যরা ১০০-৫০০০ টাকা করে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি কম খান নি বা খাইলেও তা তো আর কেউ দেখে নি। নাম ও সম্মান বজায় রাখার জন্য তাকেও কমপক্ষে ২০০ না হলেও ১০০ দিয়ে ইজ্জতের দরজা খোলা রাখতে হবে। আর যে বেচারা স্বগৌরবে ২০ হাজার টাকা খরচ করেছেন, তারও তো কিছু লাভ হতে হবে। কারণ, সে জানে ২০ হাজার টাকা খরচ করলে ১০ হাজার টাকা অবশ্যই লাভ হবে। আর এমন সুন্দর লাভের সুযোগও তো সব সময় পাওয়া যায় না। আর আমন্ত্রণকারী যদি জানে যে, আমার ২০ হাজার টাকা খরচ করতেও সে রাজি হবে না। তাহলে বুঝা গেল সুযোগে সৎ ব্যবহার হিসাবেই সব কিছুই করা হয়। এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত লেনদেনের

ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান।

পবিত্র শরীয়তের মধ্যে খতনা করা সুন্নত এবং ছওয়াবের কাজও বটে, কিন্তু ইহাতে বিভিন্ন কুসংস্কারের সংমিশ্রণ মূর্খতা ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। সাধারণ ব্যক্তি আর বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে কোনে পার্থক্য নেই কুসংস্কার সবার বেলায়ই সমান। হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ, খতনা করা সমস্ত আম্বিয়াগণের সুন্নত এবং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য- আবু আয়্যুব (রা.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- চারটি জিনিস নবীগণের সুন্নত খতনা, আতর, মিছওয়াক এবং বিবাহ। এ পবিত্র ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাগরিত কলঙ্কজনিত খারাপ উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ না করাই বিবেকের দাবী। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এ জাতীয় কুসংস্কার থেকে শুধু ধর্মীয় ঐতিহ্য অটুট ও সবল রাখার জন্যে দূরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৪. উপসংহার:

উদারহণস্বরূপ এখানে আমাদের দেশে বিদ্যমান কিছু শির্ক বিদ‘আত ও কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করা হলো। এমনিভাবে আমাদের অসংখ্য কাজকর্মে আকীদা বিশ্বাসে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈমান বিধবংসী আরো

বহু শির্ক এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা আমাদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে অহরহ আমাদের তাওহীদবাদী আকীদাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ক্ষমার অযোগ্য এই শির্কের ভয়াবহ ছোবল থেকে আমাদের সমাজ ও দেশকে মুক্ত করার জন্য একটি শির্ক নির্মূল আন্দোলনের খুবই প্রয়োজন।

৫. সুপারিশ মালা:

1. শির্ক অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে।
2. আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এমনভাবে সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে যাতে ঈমান বিধ্বংসী এ সব শির্কী সংস্কৃতি আমাদেরকে স্পর্শ না করতে পারে।
3. শির্ক অপসংস্কৃতি বিষয়ে লেখা, বক্তৃতা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের বেশি বেশি ব্যবস্থা হওয়া খুবই জরুরী।
4. কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নার আলোকেই শির্ক অপসংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ প্রয়োজন, অন্যকোন মাধ্যম থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

5. এই শির্ক অপসংস্কৃতি রোধে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা, বক্তা, খতীব ও লেখকদেরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।
6. দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে শির্কের উপর বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শির্ক ও বিদ‘আত থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক দিন। (আমীন)